প্রথম আলো

প্রাথমিক শিক্ষা ■ সাখাওয়াৎ আনসারী

সমাপনী পরীক্ষা : কিছু প্রস্তাব

এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার যে ফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বিগত বছরগুলোর তুলনায় পাসের হার যেমন কম, জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম। প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এ জন্য পরীক্ষাকালীন হরতালকে দায়ী করেছেন। *প্রথম আলোর* বিশ্লেষণে এর পেছনে দায়ী আরও তিনটি কারণ।

উচ্চমাধ্যমিক ফলের প্রসঙ্গ টেনে আমরা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা সম্পর্কে বলতে চাই যে যদি দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এ পরীক্ষার ফলও আশানুরূপ হবে না। ২০ নভেম্বর থেকে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষিত হয়েছে। পরীক্ষার বাকি আর মাত্র তিন মাস। সুতরাং, আর কালবিলম্ব না করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এর পুনর্মূল্যায়ন করে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে।

পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ নিয়ে এরই মধ্যে *প্রথম আলোতে* প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই যে এগুলোকে আমলে নিয়ে মন্ত্রণালয় পরীক্ষার সময় আধা ঘণ্টা করে বাড়িয়েছে। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট—এমনটি ভাবার কারণ নেই। কেন নেই, এবার সে আলোচনা।

প্রথমত, এ বছর পরীক্ষার্থীরা নতুন বই পড়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী বছরগুলোতে প্রশ্নপত্র থেকে যে ধারণা লাভ করেছে, এ বছরের পরীক্ষার্থীরা সে ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারা বিগত পরীক্ষার্থীদের মতো নানা গাইড বইয়ের সাহায্য পাওয়াতেও পিছিয়ে পড়েছে। কারণ, এগুলো প্রকাশিত হয়েছে বছর শুরুর কয়েক মাস পরে (গাইড বই সমর্থন না করেও এ কথা বলতে হচ্ছে)। একনিষ্ঠ পরীক্ষার্থীরা যেখানে চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার অব্যবহিত পর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল, নতুন বই জানুয়ারির আগে না পাওয়ায় বর্তমান পরীক্ষার্থীরা সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, নতুন বছরের জন্য প্রশ্নকাঠামোও নতুন হবে, এমনটিই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এ কাজটি করতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় নিয়ে ফেলায় পরীক্ষার্থীরা যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণে পিছিয়ে গেছে প্রায় সাড়ে তিন মাস। ২০ নভেম্বর পরীক্ষার হিসাব ধরলে তারা প্রকৃতপক্ষে সময় পেয়েছে সাত মাস। মাত্র সাত মাস সময় দিয়ে সাড়ে ২৬ লাখ কোমলমতি শিশু, যাদের গড় বয়স কম-বেশি মাত্র ১০, এমন একটি পাবলিক পরীক্ষায় গভীর গুহার মুখে ঠেলে দেওয়া কোনো বিচারেই সুবিবেচনাপ্রসূত নয়। প্রশ্নকাঠামো না পাওয়ায় এই সাড়ে তিন মাস বিদ্যালয়গুলো কোনো পাঠ্যসূচি ছাত্রছাত্রীদের দিতে পারেনি। শিক্ষকেরা পূর্ববর্তী বছরগুলোর ধারণা থেকে অন্ধের মতো তাদের পড়িয়েছেন, যার বড় একটি অংশ প্রশ্নকাঠামো পাওয়ার পর দেখে গেছে যে কাজে দেয়নি।

তৃতীয়ত, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ বছরের প্রশ্নকাঠামো হয়েছে কঠিনতর। আগে প্রতি বিষয়ের জন্য বইবহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক অংশের জন্য নম্বর বরাদ্দ ছিল ১০, এবার থেকে ২৫। এক লাফেই আড়াই গুণ বৃদ্ধি। প্রশ্নকাঠামোর প্রকৃতি এমন যে মা-বাবা বা অভিভাবক উচ্চশিক্ষিত না হলে সন্তানদের পড়াতে পারবেন না। বিশেষ করে বাংলা ও ইংরেজি। এ জন্য সবচেয়ে বড় খেসারত দিতে হবে গ্রামগঞ্জের বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের। প্রশ্নকাঠামোর বিস্তৃতি এবং কাঠিন্য দেখে মনে হয়, এই কোমলমতি বাচ্চারা সব পিলিপিপ, শিক্ষা বিভাগের কর্তারা এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি দিচ্ছেন এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এরা সব প্রজাতন্ত্রের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত হবে।

চতুর্থত, ছাত্রছাত্রীদের পাড়ি দিতে হয়েছে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশ। মুহুর্মুহু ও সিরিজ হরতাল-গোলার কারণে বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে মারাত্মকভাবে। ক্লাস তো দূরের কথা, উদয়ন বিদ্যালয়ের উদাহরণ টেনে বলতে হয়, নিজস্ব পরীক্ষাই নিতে হয়েছে তিন-তিনবার তারিখ নির্ধারণের মাধ্যমে। সামনের যে দিনগুলো, সেগুলো যে নিয়ে আসছে আরও ভয়াবহতা, তা বলাই বাহুল্য।

> একনিষ্ঠ পরীক্ষার্থীরা যেখানে চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার অব্যবহিত পর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল, নতুন বই জানুয়ারির আগে না পাওয়ায় বর্তমান পরীক্ষার্থীরা সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে

প্রথমত, প্রশ্নকাঠামোকে সহজতর এবং নম্বর প্রদানকে বৃদ্ধি করে। যোগ্যতাভিত্তিক অংশকে ১৫, নিদেনপক্ষে ২০-এ নামিয়ে আনা যেতে পারে। প্রশ্নসংখ্যাকেও কমিয়ে আনা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বাংলায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, বলা হয়েছে ১৬টি। এটি ১৩টি বা ১৪টি করা যেতে পারে; ইংরেজিতে ১৫টির জায়গায় করা যেতে পারে ১২ বা ১৩টি। বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্মের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের পুনর্বিন্যাস করে তিনটি থেকে দুটি অথবা দুটি থেকে একটি যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা যেতে পারে; চাওয়া যেতে পারে আটটির স্থলে পাঁচ বা ছয়টির উত্তরও। 'অথবা'র পরিমাণও বাড়ানো যেতে পারে। যেমন ইংরেজি বিষয়ে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদকে অথবা দিয়ে ইংরেজি থেকে বাংলাতে অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। নম্বর বণ্টনকেও বাড়িয়ে ৫ থেকে ১০ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে বাংলা বিষয়ে আবেদনপত্র বা চিঠি লিখনের সঙ্গে ফরম পূরণ সংযুক্ত করে ৫-এর জায়গায় নম্বর ১০ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, দুই পরীক্ষার মধ্যবর্তী সময়কে বৃদ্ধি করে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু ২০ নভেম্বর, পরীক্ষা শেষ ২৮ নভেম্বর; অর্থাৎ পরীক্ষায় ব্যাপ্তিকাল মোট নয় দিন। সূচি থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধু ইংরেজির আগে দুই দিন এবং বিজ্ঞানের আগে এক দিন গ্যাপ রয়েছে। বাংলা, সমাজ ও ধর্ম পরীক্ষার আগে কোনো গ্যাপ নেই। দেড়টায় পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি এসে খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম ও ঘুম শেষে বিকেলে বড়জোর দেড় ঘণ্টা পড়াশোনার সুযোগ আছে। রাতে তিন ঘণ্টা আর সকালে দেড় ঘণ্টাও যদি ধরি, তাহলে সাকল্যে ছয় ঘণ্টা। সমাজের ১৩ অধ্যায়ে মূল টেক্সটই ৯৬ পৃষ্ঠা আর ধর্মের পাঁচ অধ্যায়ে মূল টেক্সট ১২২ পৃষ্ঠা, শূন্যস্থান পূরণ, এমসিকিউ ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু সংক্ষিপ্ত এবং বর্ণনামূলক প্রশ্নই আছে সমাজে ৬৮ এবং ধর্মে ১১৭টি। শিক্ষা অধিকর্তাদের কাছে প্রশ্ন, সমাজ ও ধর্মের রিভিশনের কথা বাদই দিলাম, শুধু চোখ বুলিয়ে যাওয়ার জন্যও কি ১০ বছরের কোনো বাচ্চার জন্য ছয় ঘণ্টা বরাদ্দ রাখা যৌক্তিক। আপনারা নিজেরাই কি তা পারবেন? নাকি আপনারা মনে করেন—রিভিশন দিতে পারলে দেবে, না পারলে না দেবে, সারা বছরই তো পড়াশোনা করেছে। আর যদি কোনো বাচ্চা বলে, 'আমার ভালো লাগছে না, পেটব্যথা করছে', অথবা 'পড়তে ইচ্ছে করছে না'—তাহলে কী হবে? দোহাই আপনাদের, প্রতিটি পরীক্ষার আগে এক দিন করে গ্যাপ দিয়ে সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করুন। নয় দিনের জায়গায় মাত্র এক দিন বাড়িয়ে ১০ দিন এবং এক শনিবার পরীক্ষা নিয়েই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন যথাক্রমে গণিত ও বাংলা থাকায়, পরীক্ষা শুরুর কয়েক দিন আগে থেকেই পরীক্ষার্থীরা এ দুয়ের প্রস্তুতি নিতে পারবে। ফলে এক দিন করে গ্যাপ প্রয়োজন ইংরেজি, সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্মের জন্য। এ জন্য সময়সূচির তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি: ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৫ ও ২৭ নভেম্বর, ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৬, ও ২৮ নভেম্বর অথবা ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ নভেম্বর। কোনো জুমাবার না থাকায় প্রথম প্রস্তাবটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের প্রসঙ্গ টেনে বলতে চাই, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার শিক্ষা ইতিহাসেরই, কিন্তু ইতিহাস থেকে যে মানুষ প্রায়ই শিক্ষা নেয় না, এ শিক্ষাও ইতিহাসেরই। শ দেড়েক বছর আগে বিদ্যাসাগর শিশুদের জন্য লিখেছিলেন বোধোদয়। সাড়ে ২৬ লাখ বাচ্চাসহ ৫৩ লাখ মা-বাবার মানসিক নির্যাতন কিঞ্চিৎ প্রশমনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বোধোদয়ের প্রত্যাশা ১৫০ বছর পরে এসেও আমরা করতে পারি না!

● ড. সাখাওয়াৎ আনসারী : অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।